পওহারী বাবা

স্বামী বিবেকানন্দ

ষষ্ঠ সংস্করণ

শ্রাবণ, ১৩৪৭

পওহারী বাবা

(গাজীপুরের বিখ্যাত সাধু)

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

তাপিত জগৎকে সাহায্য কর—ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম, ভগবান্ বুদ্ধ ধর্ম্মের অন্যান্য প্রায় সকল ভাবকেই সেই সময়ের জন্য বাদ দিয়া পূর্ব্বোক্ত ভাবেরই প্রাধান্য দিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাকেও স্বার্থপূর্ণ আমিত্বে আসক্তি যে সম্পূর্ণ ভ্রমমাত্র, ইহা উপলব্ধি করিবার জন্য অনেক বর্ষ ধরিয়া আত্মানুসন্ধানে কাটাইতে হইয়াছিল। আমাদের উচ্চতম কল্পনাশক্তিও ইহা অপেক্ষা নিঃস্বার্থ ও অশ্রান্ত কর্ম্মীর ধারণায় অক্ষম, কিন্তু তাঁহাকে সমুদয় বিষয়ের রহস্য বুঝিতে যেরূপ প্রবল সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, আর কাহারও তদ্রূপ দেখা যায়? এ কথা সকল সময়েই সত্য যে, কার্য্য যে পরিমাণে মহত্তর, সেই পরিমাণে তাহার পশ্চাতে অপরোক্ষানুভূতি-শক্তি নিহিত। পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত একটি সুচিন্তিত কার্য্যপ্রণালীর প্রত্যেক খুঁটিনাটিকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অধিক একাগ্র চিন্তাশক্তির প্রয়োজন না হইতে পারে, কিন্তু প্রবল শক্তিতরঙ্গসমূহ

কেবল প্রবল একাগ্র চিন্তার পরিণাম মাত্র। সামান্য চেষ্টার জন্য হয়ত মতবাদমাত্র পর্য্যাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু যে ক্ষুদ্র বেগের দ্বারা ক্ষুদ্র লহরীর উৎপত্তি হয়, তাহা অবশ্য প্রবল উর্ম্মির জনক তীব্র বেগ হইতে অতিশয় পৃথক। তাহা হইলেও ঐ ক্ষুদ্র লহরীটি প্রবল উর্ম্মি-উৎপাদনকারী শক্তির এক ক্ষুদ্র অংশের বিকাশ মাত্র।

মন নিম্নতর কর্ম্মভূমিতে প্রবল কর্ম্মতরঙ্গ উত্থাপিত করিতে সক্ষম হইবার পূর্ব্বে তাহাকে তথ্যসমূহের—আবরণহীন তথ্যসমূহের (উঁহারা বিকটদৃশ্য ও বিভীষিকাপ্রদ হইলেও) নিকট পৌঁছিতে হইবে; সত্যকে—খাঁটি সত্যকে (যদিও উহার তীব্র স্পন্দনে হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রী ছিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে) লাভ করিতে হইবে এবং নিঃস্বার্থ ও অকপট অভিসন্ধি (যদিও উহা লাভ করিতে একটির পর আর একটি করিয়া প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটিয়া ফেলিতে হয়) উপার্জ্জন করিতে হইবে। সূক্ষ্ম বস্তু কালচক্রে প্রবাহিত হইতে হইতে ব্যক্তভাব ধারণ করিবার জন্য উহার চতুর্দ্দিকে স্থুলবস্তুসমূহ একত্রিত করিতে থাকে; অদৃশ্য—দৃশ্যের ছাঁচ ধারণ করে; সম্ভব—বাস্তবে, কারণ—কার্য্যে ও চিন্তা—পৈশিক কার্য্যে পরিণত হয়।

সহস্র সহস্র ঘটনায় যে কারণকে এখন কার্য্যরূপে পরিণত হইতে দিতেছে না, তাহা শীঘ্র বা বিলম্বে কার্য্যরূপে

প্রকাশিত হইবে; এবং এখন যতই শক্তিহীন হউক না কেন, জড়জগতে শক্তিশালী চিন্তার গৌরবের দিন আসিবে। আর যে আদর্শে ইন্দ্রিয়সুখ প্রদানের সামর্থ্য হিসাবে সকল বস্তুর গুণাগুণ বিচার করে, সে আদর্শও ঠিক নহে।

যে প্রাণী যত নিম্নতর, সে ইন্দ্রিয়ে তত অধিক সুখ অনুভব করে, সে তত অধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে বাস করে। সভ্যতা—যথার্থ সভ্যতা অর্থে বুঝা উচিত—বাহ্য সুখের পরিবর্তে উচ্চতর রাজ্যের দৃশ্য দেখাইয়া ও তথাকার সুখ আস্বাদ করাইয়া পশুভাবাপন্ন মানবকে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যাইবার শক্তি।

মানব প্রাণে প্রাণে ইহা জানে। সকল অবস্থায় সে ইহা স্পষ্টরূপে নিজে না-ও বুঝিতে পারে। ধ্যানময় জীবন সম্বন্ধে তাহার হয়ত ভিন্ন মত থাকিতে পারে। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও তাহার প্রাণের এই স্বাভাবিক ভাব লুপ্ত হয় না, উহা সদাই প্রকাশ হইবার চেষ্টা করে—তাহাতেই সে বাজিকর, বৈদ্য, ঐন্দ্রজালিক, পুরোহিত অথবা বিজ্ঞানের অধ্যাপককে সম্মান না করিয়া থাকিতে পারে না। মানব যে পরিমাণে ইন্দ্রিয়ের রাজ্য ছাড়াইয়া আসিয়া উচ্চ ভূমিতে বাস করিবার শক্তিলাভ করে, তাহার ফুসফুস যে পরিমাণে বিশুদ্ধ চিন্তাবায়ু গ্রহণ করিতে পারে এবং যতটা সময় সে এই উচ্চাবস্থায় থাকিয়া কাটাইতে পারে তাহাতেই তাহার উন্নতির পরিমাণ হয়।

সংসারে ইহা দেখাও যায় এবং ইহার অবশ্যম্ভাবিতা সহজেই বুঝা যায় যে, উন্নত মানবগণ জীবন ধারণের জন্য যতটুকু আবশ্যক, ততটুকু ব্যতীত তথা-কথিত আরামের জন্য সময় ব্যয় করিতে সম্পূর্ণ অসম্মত, আর যতই তাঁহারা উন্নত হইতে থাকেন, ততই আবশ্যকীয় কার্য্যসমূহ পর্য্যন্ত করিতে তাঁহাদের উৎসাহ কমিয়া আসিতে থাকে।

এমন কি, মানবের ধারণা ও আদর্শ অনুসারে তাহার বিলাসের ধারণা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। মানবের চেষ্টা, সে যে চিন্তা জগতে বিচরণ করিতেছে, তাহার বিলাসের বস্তুগুলি যেন যথাসম্ভব তদনুযায়ী হয়—আর ইহাই শিল্প।

"যেমন এক অগ্নি জগতে প্রবিষ্ট হইয়া নানারূপে প্রকাশ পাইতেছে, অথচ যতটুকু ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা হইতেও উহা অনেক বেশী" *—ঠিক কথা—অনন্তগুণে অধিক। এক কণা—সেই অনন্ত চিতের এক কণা-মাত্র আমাদের সুখবিধানের জন্য জড়ের রাজ্যে অবতরণ করিতে পারে—উহার অবশিষ্ট ভাগকে জড়ের ভিতর লইয়া আসিয়া আমাদের স্থূল কঠিন হস্তে এইরূপে নাড়াচাড়া করা যাইতে পারে না। সেই পরম সূক্ষ্ম পদার্থ সর্ব্বদাই আমাদের দৃষ্টিক্ষেত্র হইতে পলাইতেছে এবং উহাকে আমাদের স্তরে আনিবার চেষ্টায় উপহাস করিতেছে। এ

* কঠোপনিষদ্। ২।২।৯।

ক্ষেত্রে মহম্মদকেই পর্ব্বতের নিকট যাইতে হইবে—'না' বলিবার উপায় নাই। মানব যদি সেই উচ্চতর রাজ্যের সৌন্দর্য্য-রাশি সম্ভোগ করিতে চায়, যদি সে উহার বিমল আলোকে অবগাহন করিতে চায়, যদি সে আপন প্রাণ সেই জগৎকারণ জগৎপ্রাণের সহিত একযোগে নৃত্য করিতেছে, দেখিতে চায়, তবে তাহাকে তথায় উঠিতে হইবে।

জ্ঞানই বিস্ময়-রাজ্যের দ্বার খুলিয়া দেয়, জ্ঞানই পশুকে দেবতা করে, এবং যে জ্ঞান আমাদিগকে সেই বস্তুর নিকট লইয়া যায়, যাঁহাকে জানিলে আর সকলই জানা হয় (কস্মিন্ন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি*)—যাহা সকল জ্ঞানের হৃদয়-স্বরূপ, যাহার স্পন্দনে সমুদয় বিজ্ঞানের মৃত দেহে জীবন সঞ্চার হয়—সেই ধর্ম্মবিজ্ঞানই নিশ্চিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ উহাই কেবল মানবকে সম্পূর্ণ ধ্যানময় জীবন যাপনে সমর্থ করে। ধন্য সেই দেশ, যাহা উহাকে "পরাবিদ্য" নামে অভিহিত করিয়াছে!

কর্ম্মজীবনে তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইতে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু তথাপি আদর্শটি এখনও নষ্ট হয় না। একদিকে, আমাদের কর্ত্তব্য এই যে,—আমরা আদর্শের দিকে সুনির্দ্দিষ্ট পদক্ষেপেই অগ্রসর হই বা অতি ধীরে ধীরে অননুভাব্য-গতিতে উহার দিকে হামাগুড়ি

* মুণ্ডকোপনিষদ্।১।১।৩।

দিয়াই অগ্রসর হই, আমরা যেন উহাকে কখনও বিস্মৃত না হই। আবার অপর দিকে দেখা যায়, যদিও আমরা আমাদের চক্ষে হস্ত দিয়া উহার জ্যোতিঃকে ঢাকিয়া রাখিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করি, তথাপি উহা সর্ব্বদাই আমাদের সম্মুখে অস্পষ্টভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

আদর্শই কর্ম্মজীবনের প্রাণ। আমরা দার্শনিক বিচারই করি, অথবা প্রাত্যহিক জীবনের কঠোর কর্ত্তব্যসমূহই সম্পন্ন করিয়া যাই, আদর্শ আমাদের সমগ্র জীবনটাকে আচ্ছন্ন করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। আদর্শের রশ্মি নানা সরল বা বক্র রেখায় প্রতিবিম্বিত ও পরাবর্ত্তিত (Refracted) হইয়া আমাদের জীবন-গৃহের প্রতি ছিদ্রপথে আসিতেছে, আর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক কার্য্যই ইহার আলোকে করিতে হয়, প্রত্যেক বস্তুই ইহার দ্বারা পরিবর্ত্তিত ও সুরূপ বা কুরূপ প্রাপ্ত ভাবে দেখিতে হয়। আমরা এক্ষণে যাহা, আদর্শই আমাদিগকে তাহা করিয়াছে, আর আদর্শ ই আমাদিগকে ভবিষ্যতে যাহা হইব, তাহা করিবে। আদর্শের শক্তি আমাদিগকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে আর আমাদের সুখে দুঃখে, আমাদের বড় বা ছোট কাজে এবং আমাদের ধর্ম্মাধর্ম্মে উহার শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে।

যদি কর্ম্মজীবনের উপর আদর্শের এইরূপ প্রভাব হয়, কর্ম্মজীবনও আদর্শ গঠনে তদ্রূপ কম শক্তিমান্ নহে। আদর্শের সত্য কর্ম্মজীবনেই প্রমাণিত। আদর্শের পরিণতি

কর্ম্মজীবনের প্রত্যক্ষ অনুভবে। আদর্শ থাকিলেই প্রমাণিত হয় যে, কোন না কোনখানে, কোন না কোনরূপে উহা কর্ম্মজীবনেও পরিণত হইয়াছে। আদর্শ বৃহত্তর হইতে পারে, কিন্তু উহা কর্ম্মজীবনের ক্ষুদ্রক্ষুদ্র অংশের বিস্তৃত ভাব মাত্র। আদর্শ অনেক স্থলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মবিন্দুর সমষ্টি ও সাধারণ ভাব মাত্র।

কর্ম্মজীবনেই আদর্শের শক্তি প্রকাশ। কর্ম্মজীবনের মধ্য দিয়াই উহা আমাদের উপর কার্য্য করিতে পারে। কর্ম্ম-জীবনের মধ্য দিয়া আদর্শ আমাদের জীবনে গ্রহণোপযোগী আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভূমিতে অবতরণ করে। কর্ম্মজীবনকে সোপান করিয়াই আমরা আদর্শে আরোহণ করি; উহারই উপর আমাদের আশা ভরসা সব রাখি; উহাই আমাদিগকে কার্য্যে উৎসাহ দেয়।

যাহাদের বাক্যতুলিকা আদর্শকে অতি সুন্দর বর্ণে অঙ্কিত করিতে পারে অথবা যাহারা সূক্ষ্মতম তত্ত্বসমূহ উদ্ভাবন করিতে পারে, এরূপ লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি অপেক্ষা এক ব্যক্তি যে নিজ জীবনে উহাকে প্রতিফলিত করিতে পারিয়াছে—সেই অধিক শক্তিশালী।

ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত না হইলে এবং অল্প বিস্তর কৃতকার্য্যতার সহিত উহাকে কর্ম্মজীবনে পরিণত করিতে যত্নবান্ একদল অনুবর্ত্তী না পাইলে, মানবজাতির নিকট দর্শনশাস্ত্র-সমূহ নিরর্থক প্রতীয়মান হয়, জোর উহা কেবল

মানসিক ব্যায়াম মাত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যে সকল মতে একটা কিছু প্রত্যক্ষ বস্তু পাইবার আশা দেয় না, সেই গুলিকে কতকগুলি লোক গ্রহণ করিয়া কতকটা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে কিন্তু উহাদেরও স্থায়িত্বের জন্য জনসঙ্ঘের আবশ্যক করে, কারণ উহারই অভাবে প্রত্যক্ষবাদাত্মক অনেক মত লোপ পাইয়াছে।

আমাদের মধ্যে অনেকেই চিন্তাশীলতার সহিত কর্ম্মের সামঞ্জস্য রাখিতে পারি না। কতকগুলি মহাত্মা পারেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই বোধ হয়, গভীর ভাবে মনন করিতে যাইলে কার্য্যশক্তি হারাইয়া ফেলি এবং অধিক কার্য্য করিতে গেলে আবার গভীর চিন্তাশক্তি হারাইয়া বসি। এই কারণেই অনেক মহামনস্বিগণকে, তাঁহারা যে সকল উচ্চ উচ্চ আদর্শ জীবনে উপলব্ধি করেন, সেই গুলি জগতে কার্য্যে পরিণত করিবার ভার কালের হস্তে ন্যস্ত করিয়া যাইতে হয়। যতদিন না অপেক্ষাকৃত ক্রিয়াশীল মস্তিষ্ক আসিয়া উহাদিগকে কার্য্যে পরিণত ও প্রচার করিতেছেন, ততদিন তাঁহাদের মননরাশিকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু এই কথা লিখিতে লিখিতেই আমরা যেন দিব্যচক্ষে সেই পার্থসারথিকে দেখিতেছি, তিনি যেন উভয় বিরোধী সৈন্যদলের মধ্যে রথে দাঁড়াইয়া বামহস্তে দৃপ্ত অশ্বগণকে সংযত করিতেছেন—বর্ম্মপরিহিত যোদ্ধৃবেশ—প্রখর দৃষ্টি দ্বারা সমবেত বিপুল সৈন্যরাশিকে

দর্শন করিতেছেন এবং যেন স্বাভাবিক জ্ঞানের দ্বারা উভয় দলের সৈন্যসজ্জার প্রত্যেক খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত ওজন করিয়া দেখিতেছেন—আবার অপর দিকে, আমরা যেন, ভীতি-প্রাপ্ত অর্জ্জুনকে চমকিত করিয়া তাঁহার মুখ হইতে কর্ম্মের অত্যদ্ভুত রহস্য বাহির হইতেছে, শুনিতেছি—

"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥"

—ভগবদ্গীতা।

যিনি কর্ম্মের মধ্যে অকর্ম্ম অর্থাৎ বিশ্রাম বা শান্তি এবং অকর্ম্মে অর্থাৎ শান্তির ভিতর কর্ম্ম দেখেন, মনুষ্যগণের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী, তিনিই সকল কর্ম্ম করিয়াছেন।

ইহাই পূর্ণ আদর্শ। কিন্তু খুব কম লোকে এই আদর্শে পঁহুছিয়া থাকে। সুতরাং আমাদিগকে যেমনটি আছে তেমনটিই লইতে হইবে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিতে প্রকাশিত মানবের বিভিন্ন প্রকারের চরিত্রবিকাশগুলিকে লইয়া একত্র গ্রথিত করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইবে।

ধর্ম্মাবলম্বীদের ভিতর আমরা তীব্র চিন্তাশীল (জ্ঞান-যোগী), অপরের সাহায্যের জন্য প্রবল কর্ম্মানুষ্ঠানকারী (কর্ম্মযোগী), সাহসের সহিত আত্মসাক্ষাৎকারে অগ্রসর (রাজযোগী) এবং শান্ত ও বিনয়ী ব্যক্তি (ভক্তিযোগী) —এই চারি প্রকারের সাধক দেখিতে পাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বর্ত্তমান প্রবন্ধে যাঁহার চরিত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হইবে, তিনি একজন অদ্ভুত বিনয়ী ও গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন।

পওহারী বাবা (শেষ জীবনে ইনি এই নামে অভিহিত হইতেন) বারাণসী জেলার গুজী নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি বাল্যকালেই গাজিপুরে তাঁহার পিতৃব্যের নিকট বাস ও তাঁহার নিকট শিক্ষা করিবার জন্য আসিলেন।

বর্ত্তমানকালে হিন্দু সাধুরা—সন্ন্যাসী, যোগী, বৈরাগী ও পন্থী প্রধানতঃ এই চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সন্ন্যাসীরা শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী অদ্বৈতবাদী। যোগীরা যদিও অদ্বৈতবাদী, তথাপি তাঁহারা বিভিন্নপ্রকার যোগপ্রণালীর সাধন করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে পরিগণিত করা হয়। বৈরাগীরা রামানুজ ও অন্যান্য দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের অনুবর্ত্তী। মুসলমান-রাজত্বের সময় যে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে পন্থী বলে—ইহাদের মধ্যে অদ্বৈত ও দ্বৈত উভয় প্রকার মতাবলম্বীই দেখিতে পাওয়া যায়। পওহারী বাবার পিতৃব্য রামানুজ বা শ্রী-সম্প্রদায়ভুক্ত একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন—অর্থাৎ তিনি আজীবন অবিবাহিত

জীবন যাপন করিবেন, এই ব্রত লইয়াছিলেন। গাজিপুরের দুই মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে তাঁহার একখণ্ড জমি ছিল, তিনি সেই খানেই বাস করিতেন। তাঁহার অনেকগুলি ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল বলিয়া তিনি পওহারী বাবাকে নিজ বাটীতে রাখিয়াছিলেন, আর তাঁহাকেই তাঁহার বিষয় ও পদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন।

পওহারী বাবার এই সময়কার জীবনের ঘটনা বিশেষ কিছু জানা যায় না। যে সকল বিশেষত্বের জন্য ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি এরূপ সুপরিচিত হইয়াছিলেন, সে সকলের কোন লক্ষণ তখন তাঁহাতে প্রকাশ হইয়াছিল বলিয়াও বোধ হয় না। এইটুকুই লোকের স্মরণ আছে যে তিনি ব্যাকরণ, ন্যায় এবং নিজ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ অতিশয় মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতেন—এদিকে খুব চট্পটে ও আমুদে ছিলেন। সময়ে সময়ে এই আমোদের মাত্রা এত বাড়িয়া উঠিত যে তাঁহার সহপাঠী ছাত্রগণকে তাঁহার এই রঙ্গপ্রিয়তার ফলে বিলক্ষণ ভুগিতে হইত।

এইরূপে প্রাচীন ধরণের ভারতীয় ছাত্রজীবনের দৈনন্দিন কার্য্যের ভিতর দিয়া ভাবী মহাত্মার বাল্যজীবন কাটিতে লাগিল ; আর তাঁহার অধ্যয়নে অসাধারণ অনুরাগ ও ভাষাশিক্ষায় অপূর্ব্ব পটুতা ব্যতীত সেই সরল, সদানন্দময় ক্রীড়াশীল ছাত্রজীবনে এরূপ কিছু পরিচয় পাওয়া যায় নাই, যাহাতে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সেই প্রবল

গাম্ভীর্য্য সূচিত করিবে—যাহার চূড়ান্ত পরিণাম এক অত্যদ্ভুত ও ভয়ানক আত্মাহুতি—তখন সকলের নিকট উহা কেবল অতীতের কিম্বদন্তীস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

এই সময় এমন এক ঘটনা ঘটিল, যাহাতে এই অধ্যয়নশীল যুবক সম্ভবতঃ এই প্রথম জীবনের গভীর মর্ম্ম প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন; এতদিন তাঁহার যে দৃষ্টি পুস্তক-নিবদ্ধ ছিল, তখন তাহা উঠাইয়া তিনি নিজ মনোজগৎ তন্ন তন্ন ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন; ধর্ম্মের মধ্যে পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়া যথার্থ সত্য কিছু আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইল—তাঁহার পিতৃব্যের দেহত্যাগ হইল। যে এক মুখের দিকে চাহিয়া তিনি জীবন ধারণ করিতেন, যাঁহার উপর এই যুবক-হৃদয়ের সমুদয় ভালবাসা নিবদ্ধ ছিল, তিনি চলিয়া গেলেন। তখন সেই উদ্দাম যুবক হৃদয়ের অন্তস্তল শোকাহত হইয়া ঐ শূন্যস্থান পূরণ করিবার জন্য এমন বস্তুর অন্বেষণে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইলেন, যাহার কখন পরিণাম নাই।

ভারতের সকল বিষয়ের জন্যই আমাদের গুরুর প্রয়োজন হয়। আমরা—হিন্দুরা—বিশ্বাস করি, পুস্তক কেবল তত্ত্ববিশেষের ভাসা ভাসা বর্ণনা মাত্র। সকল শিল্পের, সকল বিদ্যার, সর্ব্বোপরি ধর্ম্মের জীবন্ত রহস্য-সমূহ গুরু হইতে শিষ্যে সঞ্চারিত হওয়া চাই।

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের দৃঢ় অনুরাগী ব্যক্তি-

গণ অন্তর্জীবনের রহস্য নির্ব্বিঘ্নে আলোচনার জন্য সর্ব্বদাই লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া অতি নিভৃত স্থানসমূহে গিয়া বাস করিয়াছেন; আর এখনও এমন একটি বন, পর্ব্বত বা পবিত্রস্থান নাই, কিম্বদন্তী যাহাকে কোন মহাত্মার বাসস্থান বলিয়া উহার অঙ্গে পবিত্রতার মহিমা মাখাইয়া না দেয়।

তার পর এই উক্তিটিও সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ যে,

"রমতা সাধু, বহতা পানি।
যহ কভি না মৈল লখানি॥"

অর্থাৎ যে জল প্রবাহিত হয়, তাহা যেমন বিশুদ্ধ থাকে, তদ্রূপ যে সাধু ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, তিনিও তদ্রূপ পবিত্র থাকেন।

ভারতে যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিচরণ করিয়া বিভিন্ন তীর্থ ও দেবমন্দির দর্শন করিয়াই অধিকাংশ জীবন কাটাইয়া থাকেন—কোন জিনিষ যেমন সর্ব্বদা নাড়াচাড়া করিলে তাহাতে মরিচা ধরে না, তাঁহারা বলেন, এইরূপ ভ্রমণে তাঁহাদের মধ্যেও তদ্রূপ মলিনতা প্রবেশ করিবে না। ইহাতে আর এক উপকার হয় এই যে, তাঁহারা প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বারে ধর্ম্ম বহন করিয়া লইয়া যান। যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের পক্ষেই ভারতের চারি কোণে অবস্থিত

চারিটি প্রধান স্থান (চার ধাম—উত্তরে বদরী কেদার, পূর্ব্বে পুরী, দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও পশ্চিমে দ্বারকা) দর্শন করা একরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াই বিবেচিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত সমুদয় বিষয়গুলিই আমাদের যুবক ব্রহ্মচারীর ভারতভ্রমণের পক্ষে প্রবল প্ররোচক কারণ হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, জ্ঞানতৃষ্ণাই তাঁহার ভ্রমণের সর্ব্বপ্রধান কারণ। আমরা তাঁহার ভ্রমণ সম্বন্ধে খুব অল্পই জানি, তবে তাঁহার সম্প্রদায়ের অধিকাংশ গ্রন্থ যে ভাষায় লিখিত সেই দ্রাবিড় ভাষাসমূহে তাঁহার জ্ঞান দেখিয়া এবং শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণের প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার সম্পূর্ণ পরিচয় দেখিয়া আমরা অনুমান করি, দাক্ষিণাত্যে ও বাঙ্গালা দেশে তাঁহার স্থিতি বড় অল্প দিন হয় নাই।

কিন্তু তাঁহার একটি স্থানে গমনের সম্বন্ধে তাঁহার যৌবনকালের বন্ধুগণ বিশেষরূপ জোর দিয়া বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, কাঠিয়াওয়াড়ে গিরনার পর্ব্বতের শীর্ষদেশে তিনি প্রথমে যোগসাধনার রহস্যে দীক্ষিত হন।

এই পর্ব্বত বৌদ্ধদের চক্ষে অতি পবিত্র ছিল। এই পর্ব্বতের পাদদেশে সেই সুবৃহৎ শিলা বিদ্যমান, যাহার উপর সম্রাট্‌কুলের মধ্যে ধার্ম্মিকচূড়ামণি ধর্ম্মাশোকের সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কৃত অনুশাসন খোদিত আছে। উহার নিম্নদেশে শত শত শতাব্দীর বিস্মৃতির অন্ধকারগর্ভে লীন

হইয়া অরণ্যাবৃত বৃহৎকায় স্তূপরাজি ছিল—ঐ গুলিকে অনেকদিন ধরিয়াই গিরনার পর্ব্বতশ্রেণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলমালা বলিয়া লোকে মনে করিত। বৌদ্ধধর্ম্ম এক্ষণে যে সম্প্রদায়ের পুনঃসংশোধিত সংস্করণ বলিয়া বিবেচিত হয়—সেই ধর্ম্মসম্প্রদায় এখনও উহাকে বড় কম পবিত্র মনে করে না—আর আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই জৈনধর্ম্ম তাহার জগজ্জয়ী উত্তরাধিকারী আধুনিক হিন্দুধর্ম্মে মিশাইয়া যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাহসপূর্ব্বক স্থাপত্যক্ষেত্রে বিজয়লাভ করিবার চেষ্টা করে নাই।

তৃতীয় অধ্যায়

মহাযোগী অবধূতগুরু দত্তাত্রেয়ের পবিত্র নিবাসভূমি বলিয়া গিরনার হিন্দুদের মধ্যে বিখ্যাত; আর কিম্বদন্তী আছে যে, এই পর্ব্বতের চূড়ায় সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ এখনও বড় বড় সিদ্ধ যোগীর সাক্ষাৎ পাইয়া থাকেন।

তারপর আমরা দেখিতে পাই, এই যুবক ব্রহ্মচারী বারাণসীর নিকটে গঙ্গাতীরে জনৈক যোগসাধক সন্ন্যাসীর শিষ্যরূপে বাস করেন। এই সন্ন্যাসীটি নদীর উচ্চ তটভূমির উপর খনিত একটি গর্ত্তে বাস করিতেন। আমাদের প্রবন্ধের বিষয়ীভূত মহাত্মা পরজীবনে গাজি-পুরের নিকট গঙ্গাতীরে এক ভূখণ্ড খনন করিয়া তন্মধ্যে এক গভীর বিবর প্রস্তুত করিয়া বাস করিতেন; এইরূপ অনুষ্ঠান তিনি যে ইঁহার নিকটেই শিখিয়াছিলেন, এটি বেশ বুঝিতে পারা যায়।

যোগীরা যোগাভ্যাসের সুবিধার জন্য সর্ব্বদাই গুহায় অথবা যেখানকার আবহাওয়ার কোনরূপ পরিবর্ত্তন নাই এবং যেখানে কোন শব্দ মনকে বিচলিত করিতে না পারে, এমন স্থানে বাস করিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

আমরা আরও জানিতে পারি যে, তিনি প্রায় এই

সময়েই বারাণসীতে জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিতে ছিলেন।

অনেক বর্ষ ভ্রমণ, অধ্যয়ন ও সাধনার পর এই ব্রহ্মচারী যুবক, যে স্থানে বাল্যকালে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, তথায় ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পিতৃব্য যদি তখন জীবিত থাকিতেন, তবে তিনি সম্ভবতঃ এই বালকের মুখমণ্ডলে সেই জ্যোতিঃ দেখিতে পাইতেন, যাহা প্রাচীনকালে জনৈক শ্রেষ্ঠতম ঋষি তাঁহার শিষ্যের মুখে দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 'ব্রহ্মবিদিব বৈ সোম্য ভাসি' *—হে সৌম্য, আজ তোমার মুখ যে ব্রহ্মজ্যোতিঃতে দীপ্তি পাইতেছে, দেখিতেছি। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনে স্বাগত অভ্যর্থনা করিলেন, তাঁহারা তাঁহার বাল্য কালের সঙ্গী মাত্র—তাঁহাদের অনেকেই সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন—সংসার চিরদিনের জন্য তাঁহাদিগকে বাঁধিয়াছিল—যে সংসারে চিন্তাশীলতা অল্প, কিন্তু কর্ম্ম অনন্ত।

তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের পঠদ্দশার বন্ধু ও ক্রীড়াসঙ্গীর (যাঁহার ভাব বুঝিতে তাঁহারা অভ্যস্ত ছিলেন) সমুদয় চরিত্র ও ব্যবহারে এক পরিবর্ত্তন—রহস্যময় পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন—ঐ পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে ভয়বিস্ময়ের উদ্রেক হইল। কিন্তু উহাতে তাঁহাদের হৃদয়ে

* ছান্দোগ্য উপনিষদ্। ৪।২।৯।২

তাঁহার মতন হইবার ইচ্ছা, অথবা তাঁহার ন্যায় তত্ত্বান্বেষণ-স্পৃহা জাগরিত হইল না। তাঁহারা দেখিলেন, এ এক অদ্ভুত মানব—এই যন্ত্রণা ও জড়বাদপূর্ণ সংসারের বাহিরে একেবারে চলিয়া গিয়াছে—এই পর্য্যন্ত। তাঁহারা স্বভাবতঃই তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেন, আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন না।

ইতিমধ্যে এই মহাত্মার বিশেষত্বসমূহ দিন দিন অধিকতর পরিস্ফুট হইতে লাগিল। বারাণসীর সন্নিকটবাসী তাঁহার গুরুর মত, তিনিও ভূমিতে একটি গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক ঘণ্টা করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তার পর তিনি আহার সম্বন্ধে অতি ভয়ানক কঠোর সংযম আরম্ভ করিলেন। সারাদিন তিনি নিজের ছোট আশ্রমটিতে কার্য্য করিতেন—তদীয় পরম প্রেমাস্পদ প্রভু রামচন্দ্রের পূজা করিতেন, উত্তম খাদ্য রন্ধন করিয়া (কথিত আছে, তিনি রন্ধনবিদ্যায় অসাধারণ পটু ছিলেন) ঠাকুরকে ভোগ দিতেন, তার পর সেই প্রসাদ বন্ধুবান্ধবগণ ও দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন, এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহাদের সেবা করিতেন। তাহারা সকলে যখন শয়ন করিত, তখন এই যুবক গোপনে সন্তরণ দ্বারা গঙ্গা পার হইয়া উহার অপর তীরে যাইতেন। তথায় সারা রাত সাধনভজনে কাটাইয়া উষার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিয়া বন্ধুবর্গকে জাগাইতেন

এবং পুনর্ব্বার সেই নিত্য কার্য্য আরম্ভ করিতেন, আমরা যাহাকে ভারতে 'অপরের সেবা বা পূজা' বলিয়া থাকি।

ইতিমধ্যে তাঁহার নিজের খাওয়াও কমিয়া আসিতে লাগিল; অবশেষে আমরা শুনিয়াছি, উহা প্রত্যহ এক মুঠা তেত নিম পাতা বা কয়েকটা লঙ্কা মাত্রে দাঁড়াইল। তার পর তাঁহার গঙ্গাপারস্থ জঙ্গলে প্রত্যহ রাত্রে সাধনের জন্য যাওয়া ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে লাগিল—তিনি তাঁহার প্রস্তুত গুহাতে বেশী বেশী বাস করিতে লাগিলেন। আমরা শুনিয়াছি, সেই গুহায় তিনি দিনের পর দিন ও মাসের পর মাস ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিতেন, তার পর বাহির হইতেন। এই দীর্ঘকাল তিনি কি খাইয়া থাকিতেন, তাহা কেহই জানে না; তজ্জন্য লোকে তাঁহাকে "পও-আহারী" অর্থাৎ বায়ুভক্ষণকারী বাবা বলিতে আরম্ভ করিল।

তিনি তাঁহার জীবনে কখন এই স্থান ত্যাগ করেন নাই। একবার তিনি এত অধিকদিন ধরিয়া ঐ গুহার মধ্যে ছিলেন যে, লোকে তাঁহাকে মৃত বলিয়া স্থির করিয়াছিল। কিন্তু অনেকদিন পরে আবার বাবা বাহির হইয়া বহুসংখ্যক সাধুকে এক ভাণ্ডারা দিলেন।

যখন তিনি ধ্যানমগ্ন না থাকিতেন, তখন তিনি তাঁহার গুহার মুখের উপরিভাগে অবস্থিত একটি গৃহে

বাস করিতেন, আর এই সময়ে যাহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তাঁহার যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল আর গাজিপুরের অহিফেনবিভাগের রায় গগনচন্দ্র বাহাদুর—যিনি স্বাভাবিক মহত্ত্ব ও ধর্ম্মপ্রবণতার জন্য সকলেরই প্রিয় হইয়াছেন—আমাদিগকে এই মহাত্মার সহিত আলাপ করাইয়া দেন।

ভারতের আরও অনেক মহাত্মার ন্যায়, এই জীবনেও বহির্জ্জগতের ক্রিড়াশীলতা বিশেষ কিছু ছিল না। "বাক্যের দ্বারা নয়, জীবনের দ্বারা শিক্ষা দিতে হইবে আর যাহারা সত্য ধারণ করিবার উপযুক্ত হইয়াছে তাহাদেরই জীবনে সত্য প্রতিফলিত হয়",—ইঁহার জীবন সেই ভারতীয় আদর্শেরই অন্যতম উদাহরণ। এইরূপ ধরনের লোকেরা যাহা তাঁহারা জানেন তাহা প্রচার করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক, কারণ তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা এই যে, বাক্যেরদ্বারা নহে, ভিতরের সাধনার দ্বারাই সত্যলাভ হয়। ধর্ম্ম তাঁহাদের নিকট সামাজিক কর্ত্তব্যের প্ররোচক শক্তিবিশেষ নহে, উহা সত্যের দৃঢ় অনুসন্ধান এবং এই জীবনেই উহার সাক্ষাৎকারস্বরূপ।

তাঁহারা কালের এক মুহূর্ত্ত হইতে অপর মুহূর্ত্তের অধিকতর কিছু শক্তি আছে, একথা অস্বীকার করেন। অতএব অনন্তকালের প্রতি মুহূর্ত্তেই অন্যান্য মুহূর্ত্তের

সহিত সমান বলিয়া তাঁহারা মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা না করিয়া এখানেই এবং এখনই ধর্ম্মের সত্যসমূহ সাক্ষাৎ দর্শন করিবার উপর জোর দিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান লেখক এক সময়ে এই মহাত্মাকে জগতের উপকার করিবার জন্য গুহা হইতে বাহিরে না আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। প্রথমতঃ, তিনি তাঁহার স্বাভাবিক বিনয় ও পরিহাসরসিকতা সহকারে নিম্নলিখিত দৃঢ় উত্তর প্রদান করেন ঃ—

"কোন দুষ্ট লোক কোন অন্যায় কার্য্য করিতেছিল, এমন সময়ে এক ব্যক্তি তাহাকে ধরিয়া ফেলে এবং শাস্তি-স্বরূপে তাহার নাক কাটিয়া দেয়। নিজের নাককাটা রূপ জগৎকে কিরূপে দেখাইবে, ইহা ভাবিয়া সে অতিশয় লজ্জিত হইল ও নিজের প্রতি নিজে অতিশয় বিরক্ত হইয়া এক জঙ্গলে পলাইয়া গেল। তথায় সে একটি ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিছাইয়া বসিয়া থাকিত আর এদিক্ ওদিকে কেহ আসিতেছে মনে হইলে অমনি গভীর ধ্যানের ভান করিত। এইরূপ ব্যবহারে লোকে সরিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, দলে দলে লোকে এই অদ্ভুত সাধুকে দেখিতে এবং পূজা করিতে আসিতে লাগিল। তখন সে দেখিল, এইরূপ অরণ্যবাসে আবার তাহার সহজে জীবিকানির্ব্বাহের উপায় হইল। এইরূপে বর্ষের পর বর্ষ চলিয়া গেল।

অবশেষে সেই স্থানের লোকে এই মৌনব্রতধারী ধ্যান-পরায়ণ সাধুর নিকট হইতে কিছু উপদেশ শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইল, বিশেষতঃ জনৈক যুবক তাঁহার নিকট সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত হইবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইল। শেষে এরূপ অবস্থা দাঁড়াইল যে আর বিলম্ব করিলে সাধুর প্রতিষ্ঠা একেবারে লোপ হয়। তখন সে একদিন মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া ঐ উৎসাহী যুবককে বলিল, 'আগামী কল্য একখানি ধারাল ক্ষুর লইয়া এখানে আসিও। যুবকটি তাহার জীবনের এই প্রধান আকাঙ্ক্ষা অতি শীঘ্রই পূর্ণ হইবে এই আশায় পরম আনন্দিত হইয়া পরদিন অতি প্রত্যুষে ক্ষুর লইয়া উপস্থিত হইল। নাককাটা সাধু তাহাকে বনের এক অতি নিভৃত স্থানে লইয়া গেল, তার পর ক্ষুরখানি হাতে লইয়া উহা খুলিল এবং এক আঘাতে তাহার নাক কাটিয়া দিয়া গম্ভীরবচনে বলিল 'হে যুবক! আমি এইরূপে এই আশ্রমে দীক্ষিত হইয়াছি। সেই দীক্ষাই আমি তোমাকে দিলাম। এখন তুমিও সুবিধা পাইলেই অপরকে নিরালস্য হইয়া এই দীক্ষা দিতে থাক।' যুবকটি লজ্জায় তাহার এই অদ্ভুত দীক্ষার রহস্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিল না এবং সে সাধ্যানুসারে তাহার গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিতে লাগিল। এইরূপে এক নাককাটা সাধু

সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়া সমগ্র দেশ ছাইয়া ফেলিল। তুমি কি আমাকেও এইরূপ আর একটি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা দেখিতে চাও?”

ইহার অনেক পরে যখন তিনি অপেক্ষাকৃত গম্ভীরভাবে ছিলেন, ঐ বিষয়ে আর একবার প্রশ্ন করাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, “তুমি কি মনে কর, স্থূলদেহ দ্বারাই কেবল অপরের উপকার সম্ভব? একটি মন শরীরের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া অপর মনসমূহকে সাহায্য করিতে পারে, ইহা কি সম্ভব বিবেচনা কর না?”

অপর কোন সময়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি এত বড় একজন যোগী, তথাপি তিনি প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য উপদিষ্ট, শ্রীরঘুনাথজীর মূর্ত্তিপূজা, হোমাদি কর্ম্ম করেন কেন? তাহাতে এই উত্তর হইল, “সকলেই নিজের কল্যাণের জন্যই কর্ম্ম করে, একথা তুমি ধরিয়া লইতেছ কেন? একজন কি অপরের জন্য কর্ম্ম করিতে পারে না?”

তার পর সকলেই সেই চোরের কথা শুনিয়াছেন; সে তাঁহার আশ্রমে চুরি করিতে আসিয়াছিল, সাধুকে দেখিয়াই সে ভীত হইয়া চুরি করা জিনিষের পৌটলা ফেলিয়া পলাইল। সাধু সেই পৌটলা লইয়া চোরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনেক দূর জোরে দৌড়িয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন; শেষে তাহার পদপ্রান্তে সেই পৌটলা

ফেলিয়া দিয়া করজোড়ে সজলনয়নে তাঁহার নিজকৃত ব্যাঘাতের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে লাগিলেন ও অতি কাতর ভাবে সেইগুলি লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "এগুলি আমার নহে, তোমার।"

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে আরও শুনিয়াছি, একবার তাঁহাকে গোখরো সাপে দংশন করে এবং যদিও কয়েক ঘণ্টার জন্য সকলে তাঁহাকে মৃত বলিয়াই স্থির করিয়াছিল, কিন্তু শেষে তিনি পুনরায় বাঁচিয়া উঠেন, আর তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে ও-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "ঐ গোখরো সাপটি আমার প্রিয়তমের নিকট হইতে দূতস্বরূপে আসিয়াছিল (পাহন দেওতা আয়া)।"

আর আমরা ইহা অনায়াসেই বিশ্বাস করিতে পারি। কারণ, আমরা জানি, তাঁহার স্বভাব কিরূপ প্রগাঢ় নম্রতা, বিনয় ও প্রেমে ভূষিত ছিল। সর্ব্বপ্রকার পীড়া তাঁহার নিকট সেই 'প্রেমাস্পদের নিকট হইতে দূতস্বরূপ' (পাহন দেওতা) ছিল; আর যদিও তিনি ঐ সকল হইতে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেন, তথাপি অপর লোকে পর্য্যন্ত ঐ পীড়াগুলিকে অন্য নামে অভিহিত করিবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।

এই অনাড়ম্বর প্রেম ও কোমলতা চতুর্দ্দিকস্থ

লোকের মধ্যে বিস্তৃত হইতে লাগিল, আর যাঁহারা ইঁহার চারিদিকের পল্লীগুলিতে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই অদ্ভুত ব্যক্তির নীরব শক্তিবিস্তারের সাক্ষ্য দিতে পারেন।

শেষাশেষি তিনি আর লোকজনের সঙ্গে দেখা করিতেন না। যখন মৃত্তিকানিম্নবর্ত্তী গুহা হইতে উঠিয়া আসিতেন, তখন লোকজনের সঙ্গে কথা কহিতেন বটে, কিন্তু মধ্যে দ্বার রুদ্ধ থাকিত। তিনি যে গুহা হইতে উঠিয়াছেন, তাহা হোমের ধূম দেখিয়া অথবা পূজার আয়োজনের শব্দে বুঝা যাইত।

তাঁহার একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি কোন সময়ে যে কার্য্য করিতেন, তাহা যতই তুচ্ছ হউক, তাহাতেই সম্পূর্ণ মগ্ন হইয়া যাইতেন। শ্রীরামচন্দ্রজীর পূজায় তিনি যেরূপ যত্ন ও মনোযোগ দিতেন, একটি তাম্রকুণ্ড মাজিতেও ঠিক তাহাই করিতেন। তিনি যে আমাদিগকে কর্ম্মরহস্য সম্বন্ধে একবার বলিয়াছিলেন, "যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি" অর্থাৎ "সিদ্ধির উপায়কেও এমন ভাবে আদর-যত্ন করিতে হইবে, যেন উহাই সিদ্ধি-স্বরূপ", তিনি নিজেই তাহার উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিলেন।

তাঁহার বিনয়ও কোনরূপ কষ্ট যন্ত্রণা বা আত্মগ্লানিময় ছিল না। একবার তিনি আমাদিগের নিকট অতি সুন্দর-ভাবে নিম্নলিখিত ভাবটি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—"হে রাজন্,

সেই প্রভু ভগবান্ অকিঞ্চনের ধন—হাঁ, তিনি তাহাদেরই, যাহারা কোন বস্তুকে এমন কি, নিজের আত্মাকে পর্য্যন্ত আমার বলিয়া অধিকার করিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছে”—এই ভাবের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াই তাঁহার স্বভাবতঃ এই বিনয় আসিয়াছিল।

তিনি সাক্ষাৎভাবে উপদেশ দিতে পারিতেন না ; কারণ, তাহা হইলেই নিজে আচার্য্যের পদ লওয়া হইল এবং নিজেকে অপরাপেক্ষা উচ্চতর আসনে বসান হইল। কিন্তু একবার তাঁহার হৃদয়-প্রস্রবণ খুলিয়া গেলে তাহা হইতে অনন্ত জ্ঞানবারি উছলিতে থাকিত, তথাপি উত্তরগুলি সব সাক্ষাৎভাবে না হইয়া পরোক্ষভাবে হইত।

তাঁহার আকার দীর্ঘ ও মাংসল ছিল, তিনি একচক্ষু ছিলেন এবং তাঁহার প্রকৃত বয়সাপেক্ষা তাঁহাকে অল্পবয়স্ক দেখাইত। তাঁহার তুল্য মধুর স্বর আমরা আর কাহারও শুনি নাই। তাঁহার জীবনের শেষ দশ বৎসর বা ততোধিক কাল তিনি সম্পূর্ণরূপে লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত ছিলেন। তাঁহার গৃহদ্বারের পশ্চাতে গোটাকতক আলু ও একটু মাখম রাখিয়া দেওয়া হইত, কখন কখন যখন তিনি সমাধিতে না থাকিতেন তখন রাত্রে উহা লইতেন। গুহার মধ্যে থাকিলে ইহাও তাঁহার প্রয়োজন হইত না।

এইরূপে যোগশাস্ত্রের সত্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ

এবং পবিত্রতা, বিনয় ও প্রেমের জীবন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ এই নীরব জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধূম দেখিলেই তিনি সমাধি হইতে উঠিয়াছেন বুঝা যাইত। একদিন উহাতে পোড়া মাংসের গন্ধ পাওয়া যাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকস্থ লোকে কিছু স্থির করিতে পারিল না। শেষে গন্ধ অসহ্য হইয়া উঠিল আর পুঞ্জীকৃত হইয়া ধূম উঠিতেছে দেখা গেল। শেষে তাহারা দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিল—দেখিল, সেই মহা-যোগী আপনাকে নিজ হোমাগ্নিতে শেষ আহুতিস্বরূপ দিয়াছেন। অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁহার দেহ ভস্মাবশিষ্ট হইল।

আমাদিগকে এখানে কালিদাসের সেই বাক্য স্মরণ করিতে হইবে,—

অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকম্।
নিন্দন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্॥

—কুমারসম্ভব।

মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ মহাত্মাগণের কার্য্যের নিন্দা করিয়া থাকে; কারণ সেই কার্য্যগুলি অসাধারণ এবং উহাদের কারণও লোকে ভাবিয়া স্থির করিতে পারে না।

তথাপি তাঁহার সহিত বিশেষ পরিচয় ছিল বলিয়া আমরা তাঁহার এই কার্য্যের কারণ সম্বন্ধে একটি আনু-মানিক সিদ্ধান্ত বলিতে সাহসী হইতেছি। আমাদের বোধ

হয়, মহাত্মা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার শেষ সময় আসিয়াছে তখন তিনি, এমন কি মৃত্যুর পরেও যাহাতে কাহাকেও কষ্ট দিতে না হয়, তজ্জন্য সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে ও সুস্থ মনে আর্য্যোচিত এই শেষ আহুতি দিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান লেখক এই পরোলোকগত মহাত্মার নিকট গভীরভাবে ঋণী—তজ্জন্য তদীয় প্রেমাস্পদ ও তৎসেবিত শ্রেষ্ঠতম আচার্য্যদিগের মধ্যে অন্যতম এই মহাত্মার উদ্দেশে, তাঁহার অযোগ্য হইলেও পূর্ব্বলিখিত কয়েক পংক্তি তৎকর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত হইল।

স্বামী সারদানন্দ প্রণীত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে এরূপ ভাবের পুস্তক ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। যে সার্ব্বজনীন উদার আধ্যাত্মিক শক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণ ও পরিচয় পাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ বেলুড়মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসিগণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জগদ্‌গুরু ও যুগাবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণ লইয়াছিলেন, সে ভাবটি বর্ত্তমান পুস্তক ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া অসম্ভব; কারণ, ইহা তাঁহাদেরই অন্যতমের দ্বারা লিখিত।

পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় বর্ণিত বিষয়গুলি ঐ পৃষ্ঠার পার্শ্বে 'মার্জ্জিন্যাল নোট'রূপে দেওয়া হইয়াছে। আবার ঐ নোট-সম্বলিত প্রত্যেক অধ্যায়ের বিস্তারিত সূচীপত্র গ্রন্থের প্রথমে দিয়া পুস্তক-মধ্যগত কোন বিষয় খুঁজিয়া লইতে পাঠকের বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

		সাধারণ মূল্য	উদ্বোধন গ্রাহক-পক্ষে
১ম খণ্ড—পূর্ব্বকথা ও বাল্যজীবন—	৪র্থ সংস্করণ—	১৷৵০	১৲
২য় খণ্ড—সাধকভাব—	৫ম সংস্করণ—	১৷৹	১৶০
৩য় খণ্ড—গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ—	৫ম সংস্করণ—	১৷৹	১৶০
৪র্থ খণ্ড—গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ—	৪র্থ সংস্করণ—	১৷৹	১৶০
৫ম খণ্ড—দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ—	৪র্থ সংস্করণ—	১৷৵০	১৷৹

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

১ম ভাগ—সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত (৩য় সংস্করণ), ২য় ভাগ—নূতন সংস্করণ। শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণের 'ডাইরী' হইতে সংগৃহীত। শ্রীশ্রীমায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সারগর্ভ উপদেশ—সংসারের শোকতাপে সান্ত্বনাদায়ক এবং অধ্যাত্মরাজ্যে পথ প্রদর্শক। প্রথম ভাগে ছয়খানি ছবি ও ৩৭০ পৃষ্ঠা এবং ২য় ভাগে তিনখানি ছবি ও ৪৫২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ সুন্দর বাঁধাই—প্রতিখণ্ড—২৲ টাকা।